Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No. 98-104
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পরিবেশ সংরক্ষণে মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সঞ্জয় মোদক
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, পাঁচমূড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Nature or the environment is an essential element for the sustenance and survival of humans and other creatures living on earth. Lately various types of movement and counter-movement can be observed centered on the environment. Because the environment is endangered today. So slogans are heard among people all over the world – save the earth, save the environment. Therefore, human beings have various responsibilities and duties to protect the environment. However, non-human animals are a significantly important component of the environment. These elements somehow play a great role in maintaining the balance of the environment and help in beautifying the environment. So we should be more careful and more active in providing all the materials for the survival of non-human animals in the conservation of the environment. We should take care that every creature in nature can survive equally with healthy body. No animal should disappear from the earth with its diverse species. We should all pay attention to the fact that the animals are not deprived of living facilities and food or any other kind of inconvenience. Only then can it be expected that future generations will be able to receive a beautiful world as a gift.
Keywords: পরিবেশ, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবেতর প্রাণী, দায়িত্ব-কর্তব্য, নৈতিকতা।

মূলবিষয়সমূহ: প্রকৃতি এক বিচিত্র জায়গা। প্রকৃতি বা পরিবেশ হল মানুষ এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণ ও বেঁচে থাকার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি আমাদের আশেপাশে বিরাজমান পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বাতাস, সাগর, গাছাপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি। পরিবেশের মধ্যেই আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হয় এবং এখানেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। “পরিবেশকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় - ক. জৈবিক বা জীব পরিবেশ এবং খ. অজৈব বা জড় পরিবেশ। জৈবিক বা জীব পরিবেশ বলতে চেতনাক্ষম চলাফেরা করতে সক্ষম এমন জীবকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি চেতনাসম্পন্ন জীব জৈবিক পরিবেশের আলোচ্য বিষয়বস্তু। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা প্রভৃতি জৈবিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। আর অজৈব বা জড় পরিবেশ বলতে এমন পরিবেশকে বুঝায় যাদের কোন জীবন বা চেতনাশক্তি নেই। প্রকৃতিতে আমরা নানাপ্রকার জড় বস্তু দেখতে পাই যাদের কোন জীবন নেই, নেই কোন চেতনা বা বোধশোক্তি”। [১]

সাম্প্রতিককালে পরিবেশের মূল্যায়ণ নীতিবিদ্যার কাজ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা হল মূলত প্রয়োগিক নীতিবিদ্যার একটি নতুন সংযোজন। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার মূল্য, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রতিকারের উপায় মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়। মোট কথা পরিবেশ নীতিবিদ্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতে বিরাজমান মূল্যের একটি সুবিন্যস্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। প্রাণী, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুসন্ধানই হল পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল কাজ।

বর্তমান সময়ে পরিবেশকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। কারণ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মের কারণে পরিবেশ আজ বিপন্ন হবার পথে। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের মাঝে স্লোগান শোনা যায় - পৃথিবীকে বাঁচাও, বাঁচাও পরিবেশকে। এরূপ স্লোগানের প্রধান কারণ হল, পৃথিবীর পরিবেশ মানুষের অতিরিক্ত দুষ্কর্মের ভারে এখন প্রায় বিপর্যস্ত ও কলুষিত। আজ প্রকৃতিতে দেখা যাচ্ছে নানাপ্রকার বিপর্যয় ও সমস্যা। একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত শতাব্দীতে অথবা আরও কিছু দিন আগে থেকে আমরা প্রকৃতিকে নানাভাবে অশুদ্ধ করছি বা ধ্বংস করছি। আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপকে সাধারণত প্রগতির চিহ্ন বলে মনে করা হয় তারাই পরিবেশ সংক্রান্ত সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। আমরা পরিবেশকে দূষিত করছি বিভিন্নভাবে। জনসংখ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন ক্ষয়, অরণ্যের বিনাশ, শিল্পায়নের নামে নদী ও সমুদ্রের জলের দূষণ, প্রাণী শিকার, পরমাণু বিস্ফোরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের শুদ্ধতা ও শুচিতাকে নষ্ট করেছে। এর পরিণাম ভয়াবহ। অরণ্য লোপ পাওয়ার ফলে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ এবং সেই সঙ্গে বহু কীট-পতঙ্গ যারা সেই সমস্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে থাকে তাদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। বায়ুদূষণের ফলে অক্সিজেনের অভাব ঘটছে। বায়ুদূষণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে জল দূষণ হয়। জল দূষিত হলে প্রাণী বা উদ্ভিদের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়। তাছাড়াও এই দূষিত জল ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্র, জলজ প্রাণী, এমনকি মানুষের শরীরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে মানুষ যদি প্রকৃতিকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতেই থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে পরিবেশও। এপ্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার তাঁর ‘Practical Ethics’ গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তটি হল - “১৯৯৬ সালের ১০ ই ফ্রেব্রুয়ারী ‘See Empress’ নামে একটি তৈলবাহী জাহাজ ১৪০,০০০ টন অপরিশোধিত তেল বহন করার পথে জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা লাগার ফলে জাহাজে ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্রপথে প্রায় অর্ধেক তেল সমুদ্রের জলে মিশে যায়। ঐ জায়গায় সীল, ডলফিন প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই দূষিত জলে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। এইভাবে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর যে ক্ষতি হল তা একটি পরিবেশগত সমস্যা। জাহাজটির তলদেশ যদি পুরু আস্তরণের দ্বারা আবৃত করা হত তাহলে হয়তো প্রকৃতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত”। [২]

উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে একথা স্পষ্ট যে, আমরা প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে অনেকটাই উদাসীন। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, জীব ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতিসাধক মানুষ নিজেই। প্রকৃতির প্রতি আমাদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। আমাদের নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্র শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার পরিধি অনেকে ব্যাপক। সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি পাহড়-পর্বত-নদী-সমুদ্রও এই পরিধির অন্তর্গত। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই নৈতিক দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আজ সময় এসেছে এ বিপন্ন ও বিপর্যস্ত পরিবেশকে

বাঁচানোর জন্য সোচ্চার হওয়ার। মানুষ হচ্ছে নৈতিক কর্তা। নৈতিক কর্তা হিসাবে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের নানাপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। পরিবেশকে যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সকল বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের সবচেয়েবেশি দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং যত্নবান হওয়া কর্তব্য তার মধ্যে একটি হল মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানবেতর প্রাণীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানবেতর প্রাণীর সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের কারণে এই আলোচনা একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার নীতি বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীতে আমরা নানাপ্রকার জীব বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখতে পাই। এসব জীব বৈচিত্র্য আমাদের জীবনকে করে তুলে সুন্দর ও মহিমামণ্ডিত। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনেও এরা নানাভাবে ভূমিকা রাখে ও প্রয়োজন মেটায়। মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এ সকল প্রাণীকুলকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন। এ পৃথিবীতে নানাপ্রকার প্রাণীর বসবাস। কিন্তু এসব প্রাণীর প্রতি আমাদের আচরণ যথাযথ কিনা বা কীরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে মূলত পরিবেশ নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। জগতে প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাদের এ অধিকারে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করার অধিকার বা বৈধতা কারও নেই। তাছাড়া পৃথিবী কতকগুলো মূল্য বহন করে। পরিবেশের একটি অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হল মূল্যের আলোচনা। প্রকৃতির উপাদানগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই মানুষের যেমন নৈতিক মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে তেমনি জীবজন্তুরও নৈতিক মূল্য ও নৈতিক বিবেচনার দাবি রয়েছে। পরিবেশের প্রত্যেকটি প্রজাতির স্বতন্ত্র মূল্য ও অধিকার রয়েছে। নৈতিক মূল্য সর্বদাই পশুর বাঁচার অধিকার স্বীকার করে এবং পশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার পরিহার করার পরামর্শ দেয়। এই মতানুসারে পশুরাও মানুষের মত তাৎপর্যপূর্ণ ও সমান মূল্যের অধিকারী। পরিবেশের ভারসাম্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং মানুষের উপযোগিতার জন্য এদের ভূমিকা একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য নয়। বরং এগুলো ছাড়া পরিবেশ অনেক সময় অর্থহীন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই মূল্য রয়েছে। প্রকৃতির কোন প্রাণীই মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয় নয়। বিষাক্ত সাপ, মাকড়সা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রজাতির সকল প্রাণীর মূল্য অনস্বীকার্য। "কারো কারো মতে, ব্যক্তিরই নৈতিক মূল্য আছে, ছোট ছোট প্রাণীর জীবনের কোন মূল্য নেই। তাঁদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই প্রকৃতির সম্পদ বৃদ্ধি ও সঙ্করায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতিসমূহকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ জন্য কোন প্রাণী সে যত ক্ষুদ্র বা গণনার যোগ্য বলে মনে করা না হোক, বিনা কারণে বা অপ্রয়োজনে নষ্ট করা বা মেরে ফেলা পাপ। যেকোন জীবন্ত প্রাণীর প্রতি সদয় ও সহানুভূতি প্রদর্শন নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করা হয়"। [৩]

মানুষের জীবনের মূল্য ও বেঁচে থাকার অধিকার সর্বদাই স্বীকার করা হয়। কারণ মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। তাই তাঁরা নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। এমনকি তাঁরা স্বেচ্ছায় কর্মপন্থা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মানবেতর প্রাণীকুল স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য মানবেতর প্রাণীকুল স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলেও মানুষের মত সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে। তাই যেমন মানুষের জীবনের মূল্য ও বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করা হয় তেমনি জীবজন্তুর জীবনের নৈতিক অধিকার থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা

উচিত। আমরা প্রায়ই প্রাণীদের প্রতি এমনভাবে নিষ্ঠুর ও অনাকাঙ্খিত আচরণ করে থাকি যা কোনমতেই শোভনীয় ও কাম্য নয়। "এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, একমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি বছর খাদ্য হিসাবে পাঁচ বিলিয়ন পশু জবাই করা হয়। তাছাড়া প্রতিদিন কত মোরগ-মুরগি, শূকর, ভেড়া, ছাগল ও অন্যান্য পশুপাখি খাদ্য হিসাবে জবাই করা হয় তার হিসাব ক'জনেইবা রাখে? এছাড়াও প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পশু ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন পরীক্ষণাগারে। এদের ওপর নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়, যার ফলে এদেরকে ভোগ করতে হয় অনেক দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন এবং সহ্য করতে হয় অনেক ধরনের ব্যাথা ও বেদনা। কেবল আমেরিকাতেই প্রতি বছর প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বন্য পশু শিকার করা হয় শুধুমাত্র শখের বশে"। [৪] এগুলো মানুষের কোন প্রকার কল্যাণের জন্য করা হয় না। এছাড়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ও সমুদ্রে বোমা নিক্ষেপের ফলে মাছ সহ সমুদ্রে বসবাসকারী অন্যান্য অনেক প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এরফলে শুধু যে সামুদ্রিক প্রাণীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাই নয়, বরং দূষিত হচ্ছে জল এবং বিষযুক্ত মাছ খেয়ে মারা যাচ্ছে অনেক প্রাণী ও মানুষ।

ফার্মের মালিক, পশম সংগ্রহকারী, গবেষক ও ব্যবসায়ীগণ যেভাবে এবং যে উপায়ে পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, লালনপালন ও ব্যবহার করছেন তা দেখে মনে হয় যে, এ সকল পশুদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তাঁরা হয়তো এ কথাও ভুলে গেছেন যে এদের জীবনে কোন প্রকার অনুভূতি থাকতে পারে। যারা দাবি করেন যে, আমাদের জীবন ধারনের জন্য পশুর প্রয়োজন রয়েছে এবং তাই আমরা যেভাবে ইচ্ছা হয় এদেরকে ব্যবহার করতে পারি। পিটার সিঙ্গার তাঁর 'এনিমাল লিবারেশন' গ্রন্থে তাঁদের এ দাবি প্রত্যাখান করে বলেন যে, "পশুদের আমরা যেভাবে ইচ্ছা করি সেভাবে ব্যবহার করতে পারি না"।[৫] তিনি পশুর নৈতিক মূল্য ও নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করেন এবং এগুলো রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত যে, পশুরা শুধু ইচ্ছা-অনিচ্ছাহীন যন্ত্রবৎ ক্রীয়াশীল কোন জীব নয়, বরং এদেরও সুখ-দুঃখ ও ব্যাথা-বেদনার অনুভূতি আছে। তাই এদেরও নৈতিক মূল্য রয়েছে এবং এরাও মানুষের মতো অধিকার পাওয়ার যোগ্য। নৈতিক কর্তা হিসাবে আমরা যেমন ব্যাথা-যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই না, ঠিক তেমনি পশুরা ব্যাথা-যন্ত্রনায় ছটফট করুক এটাও আমাদের কাম্য হওয়া উচিত নয়। পশু শিকার করা, কসাইখানায় পশুকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা, মাংস ভক্ষণ করা, পরীক্ষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা প্রভৃতি অনৈতিক কাজ। তাই প্রত্যেক নিঃস্বার্থবাদী মানুষের পক্ষে পশু শিকার করা বা তার মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়। এমনকি তাদের পশম ও চামড়ার তৈরি পোশাক পরিধান করা উচিত নয়। পরিবেশ সুস্থ ও অখণ্ড রাখার জন্যই এদের যত্ন করা ও ভারসাম্য রক্ষা করা একান্তভাবে প্রয়োজন। আবার বিলুপ্তপ্রায় ও দুর্লভ প্রজাতির পশুপাখি ও জীবজন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের আচরণ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কারণে -অকারণে প্রাণী হত্যা করা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ও তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা কোন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাজ হওয়া উচিত নয়। আমরা আমাদের প্রয়োজনে প্রাণীকুলকে অবশ্যই ব্যবহার করবো, তবে তা যেন অপরিকল্পিত উপায় না হয়। প্রাণীদের ওপর যেন কোন প্রকার অধিক নির্মম ও কষ্টদায়ক আচরণ না হয়। মানুষের সুন্দর স্বাস্থ্য ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল জীবন। এরূপ একটি সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য যদি প্রাণীর ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য হয় তাহলে আহারের জন্য প্রাণী হত্যা ও শিকার নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে যদি কোন বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের সেই বিকল্প পথটি গ্রহণ করা উচিত। কারণ খাদ্যের জন্য

মানবেতর প্রাণীর মাংস ব্যবহার ছাড়াই পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহ করা সম্ভব। আধুনিক পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্য মানবেতর প্রাণীর মাংস ভক্ষণ অপরিহার্য নয়। এখন অনেকে মাংসের পরিবর্তে ডাল ও শাক-সজি আহার করে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হচ্ছেন। তাই আমাদের উচিত এই বিকল্প পথটি গ্রহণ করে প্রাণীদেরকে সুন্দরভাবে নির্বিঘ্নে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া, যাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয়। তাই পরিবেশের সুরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের খাদ্যবস্তু সম্পর্কে সংযমী ও মিতব্যয়ী হতে হবে। মানুষের অতিরিক্ত আমিষ-প্রীতি কীভাবে পরিবেশ দূষণের কারণ হয়, পিটার সিঙ্গার তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনকে সংযত রাখা উচিত; প্রয়োজন সংযত হলে মাত্রাধিক পশুপালনের প্রয়োজন হবে না, বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে না, আর সেক্ষেত্রে পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। মানুষের মাত্রাধিক লোভ ও প্রয়োজন যাতে পরিবেশকে বিনষ্ট করে মানুষের এবং প্রাণীজগতের বিপন্নতা না নিয়ে আসে তার জন্য পরিবেশগত নৈতিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে"। [৬]

সাম্প্রতিককালে পল টেলর তাঁর 'রেস্‌পেক্ট ফর নেচার' গ্রন্থে বলেছেন – "প্রতিটি জীবন্ত বস্তু তার নিজস্ব উপায়ে নিজের মঙ্গল / ভালো অনুসরণ করে চলে। একবার যদি আমরা তা বুঝতে পারি, তাহলেই আমরা নিজেদের যে-ভাবে দেখি, তাদেরও সেভাবে দেখতে পারব এবং আমরা যেমন আমাদের অস্তিত্বের ওপর মূল্য আরোপ করি, অনুরূপভাবে তাদের অস্তিত্বের ওপরও একই মূল্য আরোপ করব"।[৭] টেলর প্রাণ বা জীবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভিত্তি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, অ-মানুষিক সত্তাও নিজ মূল্যেই মূল্যবান এবং প্রাণীজগতের রয়েছে মানব জগতের মতোই নৈতিক তাৎপর্য। তাঁর মতানুসারে, জগতের সকল প্রাণবান পদার্থের যে জীবন ধারনের স্পৃহা আছে, বেঁচে থাকার ইচ্ছা আছে, তা প্রকাশ পায় তাদের বৃদ্ধি (Growth), বিকাশ (Development) এবং বংশধারা (Heredity) প্রভৃতির মধ্যে। যাদের প্রাণ আছে তাদের জীবন লক্ষ্যাভিমুখী। তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। প্রাণ বা জীবন নিজস্ব মূল্যেই মূল্যবান। এই মূল্যবান প্রাণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করা মানুষের কর্তব্য। টেলর প্রকৃতির প্রতি মানুষের চারটি কর্তব্যের কথা বলেছেন। এই কর্তব্যগুলি আবার চারটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত – "ক্ষতি না করার নীতি, হস্তক্ষেপ না করার নীতি, বিশ্বস্ততার নীতি এবং ক্ষতিপূরণের নীতি। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল –

১. কোন প্রাণীর ক্ষতি না করা।
২. কোন প্রাণীর স্বাধীন জীবনে হস্তক্ষেপ না করা।
৩. প্রলোভন দেখিয়ে বন্য প্রাণীকে প্রবঞ্চিত না করা।
৪. এই নিয়মগুলি ভঙ্গ করে যদি আমরা প্রাণীজগতের ক্ষতি করি তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে সেই ক্ষতি পূরণ করা"। [৮]

সুতরাং টেলর প্রমাণ করেছেন যে, প্রাণীজগৎ মানবজগতের মতোই মূল্যবান এবং তাদের নৈতিক তাৎপর্যও সমান। তাই টেলরের মতে প্রাণীজগতের ক্ষতিসাধন না করাই (duty of non-maleficence) আমাদের মুখ্য কর্তব্য।

পরিশেষে একথাই বলতে হয় যে, মানবেতর প্রাণী পরিবেশের একটি উল্লেখ্যযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব উপাদান কোন না কোনভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে এবং পরিবেশকে শোভামণ্ডিত করতে সাহায্য-সহযোগিতা করে। তাই আমাদের উচিত এদের সংরক্ষণ ও বেঁচে থাকার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহের ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া এবং আরো তৎপর হওয়া। আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যাতে প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী সুস্থ দেহ নিয়ে সমানভাবে টিকে থাকতে পারে। কোন প্রাণী যেন তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় প্রজাতিসহ একেবারে পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায়। প্রাণীদের যাতে বসবাসের সুযোগ-সুবিধা ও খাবার ঘাটতি না হয় বা অন্য কোন প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য রক্ষার্থে এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণীদের সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য, কারণ তাদের সংরক্ষিত হবার অধিকার আছে। আমরা এমন কিছুই করতে পারি না যার ফলে তাদের এই অধিকার ক্ষুন্ন হয়। তাই নৈতিক কর্তা হিসাবে সকল মানুষের এ সকল মানবেতর প্রাণীর স্বতঃমূল্য স্বীকার করা উচিত এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের সুব্যবস্থা করা ও দুঃখ কষ্ট দূর করা উচিত। একজন নৈতিক কর্তা হিসাবে আমাদের অর্থাৎ সকল মানুষের এটি হল নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবেই আগামী প্রজন্ম একটি সুন্দর পৃথিবী উপহারস্বরূপ পেতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১। খালেক, আবদুল; প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা, অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ৩২৩।
২। গুপ্ত, দীক্ষিত; নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২৫৮।
৩। খালেক, আবদুল; প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা, অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ. ৩৪২।
৪। তদেব, পৃ. ৩৫২।
৫। তদেব, পৃ. ৩৫২।
৬। Singer, Peter; Practical Ethics, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1993, p. 288.
৭। ঘোষ, সঞ্জীব; নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৭৯।
৮। গুপ্ত, দীক্ষিত; নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২৭২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। খালেক, আবদুল; প্রয়োগিক নীতিবিদ্যা, অনন্যা, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৯।
২। রায়, প্রদীপ কুমার; ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৫।
৩। গুপ্ত, দীক্ষিত; নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭।
৪। ঘোষ, সঞ্জীব; নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনঃসংস্করণ, ২০১৮।
৫। পাল, সন্তোষ কুমার; ফলিত নীতিশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড), লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২।
৬। Singer, Peter; Practical Ethics, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1993.
৭। Mitra, Madhabendra Nath; Ethics for the use of the Environment vs Ethics of the Environment, Philosophy & Progress, Vol. XXII-XXIII, June-Dec., 1997.

৮। Taylor, P.; Respect for Life: A Theory of Environmental Ethics, Princeton University Press, Princeton, 1986.

৯। Subbarao, S.; Ethics of Ecology and Environment, Rajat Publication, New Delhi, 2001.

১০। Srivastava, D. C.; Readings in Environmental Ethics: Multidisciplinary Perspectives, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, 2005.